একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Transgender people in Bengali drama: The social form of gender issues

বাংলা নাটকে রূপান্তরকামী মানুষ: লিঙ্গ-সমস্যার সামাজিক রূপ

Name of the Author: **Dr. Sushanta Debnath**

Affiliation: **Awarded Ph.D. from Coochbehar Panchanan Burma University, West Bengal, India**

Abstract: Transgenderism is often regarded as an unnatural passion or which to accomplish physical changes in order to satisfy counter sextual needs. Thus it has been mutually substituted to mean transsexuality. But it is interesting to note that, though the definations of both terms have historically been variable, gender and sex do not imply the same thing. At the core, gender is a biological Identity; it prepares individuals ton participates in a specific culture, which is sex. This article will discuss the plays ‘Shukh’ (2015) by Tamojit Ray, ‘Antorita’ (2018) by Pronab Kumar Bhattacharjee and ‘Identity’ (2024) by Barun Deb. Tamojit Roy has presented the context of Shikhandi in the play ‘Shukh’. In fact, the Mahabharata and recalls the story of Shikhandi, who never suffered from a strong and consuming psychological desire to be changed into a man or woman, but wanted to protest and avenge the humiliation of discrimination for the women. Pronab Kumar Bhattacharjee has highlighted the life problems of transgender people and there Gender Equality in Socio-cultural Values through the play ‘Antarita’. Barun Deb of his drama ‘Identity’ has presented the life of Transgendand genders crisis of biological identity.The present paper, intends to scrutinize these vital issues of the transsexuality and we findings of Gender struggles as well as the life problems of transgender men and women in these plays.

Keywords: Discrimination, Transgender, shikhandi, Insult, society, injustice.

বাংলা নাটকে রূপান্তরকামী মানুষ: লিঙ্গ-সমস্যার সামাজিক রূপ

ড. সুশান্ত দেবনাথ

বাংলা নাটকের উৎস সন্ধানে দেখা যাচ্ছে, চর্যাপদ-এ বুদ্ধ নাটক এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ নাট্যপালার সুর অনুরণিত হয়। ঠিক তেমনিভাবে বাঙালির নাট্যচেতনায় আশ্রয় করে আছেন শ্রীচৈতন্যদেব। বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থের মধ্যখণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ রয়েছে। এ অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবের মেসোমশায় চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে (১৫০৮/১৫০৯)। সেদিন রাধাবিরহ বিষয়ক নাটক অভিনীত হয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর অভিনীত পালা বাংলাদেশে প্রচলিত কৃষ্ণযাত্রাপালার আদিরূপ। এ নাটকে শ্রীচৈতন্যদেব নারী চরিত্রে (রুক্মিনীর ভূমিকায়) অভিনয় করেছিলেন। একজন পুরুষের নারী চরিত্রে নাট্যাভিনয় থেকে রূপান্তরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাংলা নাটক ও সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নারী চরিত্রে পুরুষদের নাট্যাভিনয়ের কথা আমরা জেনে এসেছি। নারীর চরিত্রে পুরুষের নিখুঁত অভিনয় এবং সাজসজ্জার কূট-কৌশল পুরুষকে আকৃষ্ট করত, এ ধরনের কথাও জানা যায়। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে সাম্প্রতিক সময় রূপান্তরকামী বা সমকামী মানুষদের জীবন সমস্যার কথাকে তুলে ধরেছেন: শেখর সমাদ্দার, রাকেশ ঘোষ, ব্রাত্য বসু প্রমুখ। আলোচ্য প্রবন্ধে নাট্যকার তমোজিৎ রায়ের 'শুক' (২০১৫), প্রণবকুমার ভট্টাচার্যের 'অন্তরিত' (২০১৮) ও বরুণ দেবের 'আইডেন্টিটি' (২০২৪) নাট্যালোচনার মাধ্যমে রূপান্তরকামী-সমকামী মানুষের লিঙ্গ সমস্যার সামাজিকরূপ তুলে ধরা হবে।

বাংলা থিয়েটারে রূপান্তরের প্রসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬) নাটকে। এ নাটকে চিত্রাঙ্গদার মানসিক টানাপোড়েন লক্ষ করা যায়। রূপান্তর শুধু মনে নয়, দেহে প্রতিফলিত হয় চিত্রাঙ্গদার। সুপুরুষ অর্জুনকে প্রেম নিবেদন করেও ব্যর্থ হন চিত্রাঙ্গদা। তাঁর প্রেমকে প্রত্যাখান করেন অর্জুন। একজন নারীর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করার মূলে কী চিত্রাঙ্গদার দৈহিক গঠন দায়ি ছিল? কারণ, চিত্রাঙ্গদা নারী হয়েও, সে পালন করেছে পুরুষের কর্তব্য। যার পিতা তাঁকে গড়েছিলেন পুরুষের মতো করে। এর মধ্য দিয়ে রূপান্তরের প্রসঙ্গ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নাট্যকার শেখর সমাদ্দারের 'রমনীমোহন' নাটকেও ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের কথা উঠে এসেছে। ঠিক তেমনিভাবে রাকেশ ঘোষ 'বেল বাবু' নাটকে সমকামী মানুষদের অবস্থানকে স্পষ্ট করেছেন।নাট্যকার ব্রাত্য বসু 'কৃষ্ণগহ্বর' নাটকে সমকামী সম্প্রদায়ের কথাকেই তুলে ধরেছেন। নাটকে কৃষ্ণগহ্বর অর্থাৎ ফিজিক্সের ব্ল্যাকহোল থিওরিকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন নাট্যকার ব্রাত্য বসু। এমনকি চরিত্রের অর্ন্তদ্বন্দ্ব, জীবনের অনিশ্চয়তা বোঝানোর সময় কাজে লেগেছে এই থিওরি। বাংলা নাটকে এভাবে সরাসরি সমকামিতার কথা এর আগে কেউ তুলে ধরেননি। নাটকে সংলাপ নির্বাচন ও বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলতে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার। নাটকের মূলচরিত্র অংশুমান ব্যানার্জি তাই নাটকের প্রথম সংলাপেই দর্শকদের চিরাচরিত ছকে বাঁধা ধারণার মূলে আঘাত করেছেন, এভাবে— "অংশুমান— আমি মানে আমি একজন সমকামী। মানে হোমোসেক্সুয়াল। বিশ্বাস করুন ডক্টর এটা কিন্তু আমার মধ্যে কম বয়স থেকে ছিল না। মানে এই ব্যাপারটা গ্রো করেছে কয়েকমাস।"[১] এভাবে একটা সহজ ও সরাসরি স্বীকারোক্তি দর্শকের

মন ও মাথায় প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে নাট্যকারের ভূমিকাও কোনো অংশে কম নয়। এসব নাটকের মাধ্যমে রূপান্তরকামী বা ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের কথা উঠে আসার পাশাপাশি বদলাতে থাকা সমাজ, নিজেকে বদলাতে চাওয়া মানুষের জীবন সংগ্রামের কথাই উঠে এসেছে। রূপান্তরকামী মানুষদের কথা শুধু কোলকাতাকেন্দ্রিক রঙ্গালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রান্তবঙ্গের নাট্যমঞ্চে রূপান্তরকামী ও সমকামী মানুষদের সামাজিক অবস্থানকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার তমোজিৎ রায় (শুক নাটক), প্রণবকুমার ভট্টাচার্য (অন্তরিত নাটক), বরুণ দেব (আইডেন্টিটি')। এই সকল নাটকে রূপান্তরকামী-সমকামী মানুষদের লিঙ্গ সমস্যার সামাজিকরূপ উঠে আসার পাশাপাশি স্থান করে নিয়েছে তাদের লড়াই করে জীবন ধারণ ও স্থানীয় জীবন সমস্যার নানানপ্রসঙ্গ।

তমোজিৎ রায়ের 'শুক' (২০১৫) নাটকের মাধ্যমে রূপান্তরকামী মানুষের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। নাটকটি মহাভারত আশ্রিত কল্পনাট্য। নাট্যনির্মাণে নাট্যকার এস.ভইলারাপ্পার আখ্যান ও কণিকা বসু অনুদিত কন্নড় উপন্যাস 'পর্ব'কে অবলম্বন করেছেন। নাটকের মূল চরিত্রগুলি হল: পৈল, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন, সুমন্ত (এঁরা ব্যাসদেবের শিষ্য), ভীষ্ম, ব্যাসদেব, শুকপ্রান্তপাল (দুর্যোধনের সৈনিক), সত্যবতী, অম্বিকা (দাসী)। নাটকটি তিনটি দৃশ্যে বিন্যস্ত এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র হল শুক। মহাভারতের যুদ্ধের আগের রাত্রির ঘটনা এ নাটকের মূল উপজীব্য। মূলত ভীষ্ম ও শুকদেবের মধ্যে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাটকের ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। যুদ্ধ শুরুর আগের রাত্রে ভীষ্ম দেখা করতে আসে ব্যাসদেবের সঙ্গে। এসেই জানতে পারেন ব্যাসদেবের পুত্র শুক তীব্র এক মানসিক অবসাদে দীর্ণ, গত তিন দিন ধরে অন্নজল কিছুই গ্রহণ করেননি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আত্মনাশ করবেন। জীবন সম্পর্কে তিনি বীতশ্রদ্ধ এবং স্মার্থময় পৃথিবীতে তিনি বেঁচে থাকতে চান না। ভীষ্ম এরকম পরিস্থিতিতে শুকদেবকে আত্মধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হন। ভীষ্মের কাছে প্রতিভাত হয় শুক আসলে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ। কুরুবংশের দুর্যোধন তার সামনেই কীভাবে নারীকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছিলেন সেসব প্রশ্ন তুলে ধরেন পিতামহ ভীষ্মের কাছে। ভীষ্মকে মনে করিয়ে দেন:

> 'শুক।।আপনার জীবনটাই তো নারী অবমাননা আর নির্যাতনের ক্লেদাক্ত ইতিহাস...। কাশীরাজ্যের স্বয়ংবর সভা থেকে তার নিজকন্যাকে অপহরণকরলেন।তাদেরইচ্ছারবিরুদ্ধে...।'[২]

ভীষ্মদেব এসব প্রশ্ন শুনে শুকদেবকে মানসিকভাবে অসুস্থ বলে উল্লেখ করেন। ভীষ্ম শুকদেবকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হলে, শুকদেব নিজেকে শিখণ্ডী বলে উল্লেখ করেন। শিখণ্ডীরূপে ভীষ্মকে হত্যা করতে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। শুকদেব ও ভীষ্মের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাটকে এক কাল্পনিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ভীষ্মও বুঝে উঠতে পারেনি, এটা বাস্তব নাকি কল্পনা? যুদ্ধের প্রাক্‌মুহূর্তে দুর্যোধন যুদ্ধের রসদ সংগ্রহের জন্য সৈন্য পাঠান ব্যাসদেবের আশ্রমে। প্রান্তপালের নির্দেশে সৈন্যরা ব্যাসদেবের আশ্রমের সম্পদ লুট করতে প্রস্তুত হয়। অথচ ভীষ্মদেব নির্দেশ দেন ব্যাসদেবের আশ্রম যেন অক্ষত থাকে। তা সত্ত্বেও দুর্যোধন সম্পদ সংগ্রহের জন্য ব্যাসের আশ্রমে বলপূর্বক প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। শিষ্যরা প্রতিরোধ করতে চাইলে, ব্যাসদেব তাদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হতে নিষেধ করেন। জ্ঞানবিতরণের মধ্য দিয়ে মানুষকে জাগানোই যে প্রকৃত যুদ্ধ তা স্মরণ করিয়ে দেন গুরুদেব। জ্ঞানবিতরণের মধ্য দিয়ে নাটক শেষ হয়। এই নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার বলতে চেয়েছেন- ধর্মপ্রতিষ্ঠা অছিলা মাত্র, সাম্রাজ্য বিস্তার ও অধিকার আদায় একমাত্র উদ্দেশ্য।

কিন্তু এই যুদ্ধের কারবার অপ্রয়োজনীয়। ব্যাসদেবের চার শিষ্যের মধ্যে বৈশম্পায়ন চেয়েছিলেন কুরুবংশ ধ্বংস হোক, মুছে যাক শতবর্ষের ক্লেদ ও ব্যভিচার। নাট্যকার তমোজিৎ রায় এ নাটকের মাধ্যমে শুকদেবের নিজ সত্তা প্রকাশিত হয়েছে। ভীষ্ম তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ বলে উল্লেখ করেছেন মেয়েলি গঠনের জন্য। ব্যাসদেব তার সন্তান শুককে পূর্ণ সমর্থন করেছেন। তার পুত্র শুককে তার অস্তিত্বের অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। শুক নারী না পুরুষ তা নিয়ে কোনোদিন প্রশ্ন তোলেননি। শুকের শারীরিক গঠনের মাধ্যমে তৃতীয় লিঙ্গের চিন্তাচেতনা প্রকাশিত হয়েছে। রাষ্ট্রশক্তির প্রতিনিধি হিসেবে ভীষ্মকে উল্লেখ করা যায়। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের ক্ষমতার আগে ভীষ্মদেবকে ভীষণ অসহায় লাগে, না হলে ভীষ্মের সামনেই প্রান্তপাল কী করে ব্যাসদেবের আশ্রম লুট করার হুমকি দিতে পারে।

নাট্যকার শুকদেবের শারীরিক গঠনের মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত শব্দবন্ধ ‘রূপান্তরকামী’ [transgender] মানুষের পরিচয়কে তুলে ধরেছেন। ভীষ্মদেব শুকের মহলে প্রবেশ করে তাকে দেখে ইতস্ততবোধ করেন, সে বুঝে উঠতে পারেনি ইনিই সে শুকদেব। শুকের বড় চুল ও মেয়েলিগঠন তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছিল। ভীষ্ম শুককে দেখে স্বাভাবিক হতে পারেনি। তাই সে বলতে চেয়েছে— ‘নারীদের চোখে সে ক্লীব, জড়’। নারীদের দেখে তার মধ্যে পুরুষদের মতো আচরণ প্রতিফলিত হয়নি। এরকম পরিস্থিতির মধ্যে শুককে ভীষ্ম পুত্র বলে সম্বোধন করেছে। এতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কথাই উঠে এসেছে। ভীষ্ম তাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছে— ‘তোমার এ ধারণা সঠিক নয় পুত্র’। শুক ভীষ্মের কথার বিরোধিতা করেছে, এইভাবে—

‘আমি পুত্র নই... পুত্র নই আমি... এ ভুল ধারণা আমারও ছিল বাল্যকালে...।[৩]

শুক সমাজের চোখে পুরুষ হলেও, সে যুক্তির মধ্য দিয়ে বলবার চেষ্টা করেছে, সে পুরুষ নয়। বাল্যকালের ধারণা যে যৌবনে গিয়ে বদলে যায় তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। শুকের মানসিক পরিবর্তন থেকেই সে স্পষ্টভাবে ভীষ্মকে বলতে পারে- ‘আমি পুরুষ নই, নারী’। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও রাজনীতি তার পরীক্ষা নিয়েছিল পুরুষত্বের, তাতে তিনি ছিলেন নীরব। লিঙ্গ নিয়ে যে মহাভারতের সময় থেকে রাজনীতি শুরু হয়েছিল তা এখনও রয়ে গেছে সমাজে। রূপান্তরকামী মানুষেরা এখনও সমাজের চোখরাঙানি এবং নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। নাটকে শুকদেবের একটা নিজস্ব সত্তা প্রকাশিত হয়। শুকদেবের মেয়েলি গঠনের জন্য কথা শুনতে হয়েছে ভীষ্মের কাছে। এমনকি ভীষ্ম শুকদেবকে মানসিকভাবে অসুস্থ বলে উল্লেখ করেন এবং মেয়েলি অবস্থা থেকে ফিরে আসার কথা বলেন। ভীষ্ম শুকদেবকে পুত্র হিসেবে সম্বোধন করলে, শুক বোঝানোর চেষ্টা করেন সে পুত্র নয় এবং ভীষ্মকে প্রশ্ন করেন, এভাবে-

‘আপনি কি পুরুষ ভিন্ন মানুষ প্রজাতিকে ঘৃণা করেন? নারী বা আমাদের মত যারা···।[৪]

শুকের মধ্য দিয়ে তৃতীয়লিঙ্গের মানুষের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। ব্যাসদেব তার সন্তান শুককে পূর্ণ সমর্থন করেছেন। পুত্র শুককে অস্তিত্বের অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। শুক নারী না পুরুষ তা নিয়ে কোনোদিন প্রশ্ন তুলেন নি। শুকের শারীরিক গঠনের মাধ্যমে রূপান্তরকামী মানুষের প্রসঙ্গকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। প্রাচীন ভারত তথা বৈদিক যুগে তৃতীয় লিঙ্গের সন্ধান না পাওয়া গেলেও, মহাকাব্যের যুগে রূপান্তরকামী মানুষের

উপস্থিতি লক্ষণীয়। মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে শিখণ্ডীর উপস্থিতি তার প্রমাণ। তাই বলা যায়, রাষ্ট্র ক্ষমতার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তৃতীয় লিঙ্গের উপস্থিতি ছিল। ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের উপস্থিতিই প্রমাণ করে, রূপান্তরকামীতা পশ্চিমী দুনিয়ার প্রচারিত নতুন কোনো বিষয় নয়।

নাট্যকার প্রণবকুমার ভট্টাচার্য 'অন্তরিত' (২০১৮) নাটকের মাধ্যমে রূপান্তরকামী মানুষের জীবন সমস্যার কথাই তুলে ধরেছেন। নাটক শুরু হয় একটি গ্রুপ থিয়েটারের নাটক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। পরিচালক অমলদা নাটক করবেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে আশ্রয় করে। এবিয়য়ে নাটক করাকে গ্রুপের সদস্যরা মেনে নিতে চায়নি। কারণ বর্তমান সময়ের দর্শক এ ধরনের বিষয়কে পছন্দ করবেন না। এমন পরিস্থিতিতে অমলদা 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের কথা উল্লেখ করে বলেন আধুনিক সময়ের দর্শক ঠিক অনুমান করে নিতে পারবেন। অমলদা উজ্জ্বলকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, রাধাকৃষ্ণের কাহিনিকেই প্রসেনিয়াম মঞ্চে দেখানো হবে। দর্শক এর মধ্য দিয়েই ভালোবাসার বার্তা পাবে। নাটকের গতি সঞ্চারিত হয় রাধার চরিত্রে অভিনয়কারী রুদ্রকে কেন্দ্র করে। রাধার চরিত্রে একজন পুরুষ চরিত্রাভিনেতার অভিনয় মেনে নিতে চাননি কৌশিক। এ প্রসঙ্গে পরিচালক অমলদা বাংলাথিয়েটার তথা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নারী চরিত্রে পুরুষের নাট্যাভিনয়ের কথা তুলে ধরেন। এমনকী বর্তমানে বিদ্যালয় নাটকেও দেখা যায়, মেয়েরা ছেলের ভূমিকায় এবং ছেলেরা কখনও কখনও মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন। কিন্তু কৌশিক এসব যুক্তি বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মানতে চায়নি। এরূপ পরিস্থিতিতে অমল'দা মধ্য দিয়ে নাট্যকার প্রণবকুমার ভট্টাচার্য রূপান্তরকামী মানুষের অবস্থানকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন, এভাবে:

> "আর অতীতের কথা নয়, আমরা আসলে ধরতে চাইছি ভবিষ্যতের ভাবনাকে, যে ভবিষ্যতে লিঙ্গ পরিচয়েই কেবল পরিচিত হবেনা মানুষ, বায়োলজিক্যাল পরিচয়ের পাশাপাশি সমান গুরুত্ব পাবে তার সাইকোলজিক্যাল পরিচয়ও। তোমরা চৈতন্যদেবের কথা ভুলে গেলে? তিনি তো ছিলেন রাধাভাবের সাধক। তিনিই তো প্রকট করলেন রাধার ব্যাকুলতা।"[৫]

অমলদা পরিচালক হিসেবে নিজের সিদ্ধান্ত জানানোর পাশাপাশি কৌশিককে জানিয়ে দেয় নায়ক হতে যদি তার অনিচ্ছা থাকে, তাহলে তারও অল্টার করা হবে। কৌশিক চাপে পড়ে রাজি হয়ে যায়। যথারীতি নাটকের মহড়া শুরু হয় এবং রুদ্র'র রাধার চরিত্রে অভিনয় একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে যায়। রুদ্র 'নাট্যতীর্থ' গ্রুপে নাটকে অভিনয় করার সুযোগ পাওয়াকে ভালো নজরে দেখেনি তার মা। রুদ্র'র মেয়েলিভাব মা'কেও ভাবিয়ে তোলে, মা যখন ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে ওঠেন, তখন রুদ্র মা'কে বোঝানোর চেষ্টা করেন:

> "ও মা, আমার সেই একই কথা কেন বুঝতে পার না, এতে তোমার বা আমার কোনো হাত নেই। আর এর মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতাও নেই। মানুষের বায়োলজিক্যাল পরিচয় আর সাইকোলজিক্যাল পরিচয় সব সময় এক নাও হতে পারে। হ্যাঁ, আমি ছেলে হয়ে জন্মেছি, কিন্তু আমার ভেতরে লালিত হয় একটি নারীর মন। আমি এজন্য কোনো কুণ্ঠা বোধ করি না।"[৬]

রুদ্র তার অবস্থানকে পরিস্কার করে দিয়েছেন। তার এই অবস্থানের জন্য সে দায়ী নয়। এই ব্যাপারগুলো সমাজ মেনে নিতে চায় না, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। রুদ্র তার মনের কথা সহজে তার

মাকে বলে দিতে পারলেও, মা'কে সবচেয়ে বেশি কটাক্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে প্রতিবেশীদের কাছে। বিশেষত সোসাইটির মানুষ এবং নিজস্ব আত্মীয়দের মুখকে সে বন্ধ করতে পারেনি। রুদ্র'র এই মানসিক অবস্থানের জন্য, সবাই তাকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাত। নাট্যকার এই নাটকে একজন রূপান্তরকামী'র মায়ের অবস্থানকে তুলে ধরেছেন। মায়েরা ঘরে একা থাকেন, তার সন্তান রূপান্তরকামী হলে তার প্রভাব পড়ে সবচেয়ে বেশি মায়েদের ওপর। কারণ তাদের জগতটা ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রতিবেশি ও সোসাইটির মানুষদের নানা কটাক্ষ তাদের হজম করতে হয়। বাবাদের তো একটা বাইরের জগৎ আছে। সেই জগৎ থেকে মেয়েদের জগৎটা আলাদা। তাই রুদ্র'র মা বলেছে—

> 'তোমার বাবাকে প্রতিদিন অসংখ্য মহিলার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে হয় না। তাও তো তিনি একসঙ্গে বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছেন।'[৭]

রুদ্র তার মায়ের অবস্থানকে অনুভব করেছেন এবং নিজেদের অবস্থানের কথা স্পষ্ট করে বলতে চেয়েছে। এ অবস্থার জন্য তারা দায়ি নন—

> 'কেন মা, আমাদের শুধু দেখা হবে একই দৃষ্টিকোণ থেকে? আমাদের অন্য সব প্রতিভা কেন চাপা পড়ে যাবে শুধু এই পরিচয়ের আড়ালে। চপল ভাদুড়ি, ঋতুপর্ণ ঘোষ থেকে শুরু করে ভার্জিনিয়া উলফ, সবাই কি প্রতিষ্ঠিত হননি নিজের নিজের ক্ষেত্রে? অথচ এরা প্রত্যেকেই নিজেদের সাইকোলজিক্যাল পরিচয়কে ঘোষণা করেছেন সোচ্চারে।'[৮]

এ নাটকের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রূপান্তরকামী মানুষদের অবস্থান। তারা প্রতিক্ষেত্রে সমাজের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে থাকেন। সমাজ কখনও তাদের পাশে দাঁড়ায় না। পরিবারের মানুষ যারা থাকে তারাও সংকোচবোধ করেন। কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের এগিয়ে যেতে হয়। রূপান্তরকামীরা নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তী জীবনে তারা সুখী হননি, তা বলার চেষ্টা করেন রুদ্রকে তার মা।

নাট্যকার রূদ্র ও তার মায়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে রূপান্তরকামী মানুষদের অবস্থানকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। সাহিত্যে ও বাস্তবে রূপান্তরকামীদের যে লড়াই ও সংগ্রামের কথা আমরা জানতে পারি, তার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সমাজ শিখণ্ডীকে ব্যবহার করেছে, কিন্তু তাকে উপযুক্ত সম্মান দেয়নি। কৃষ্ণের পরামর্শে ক্ষত্রিয় বীর অর্জুন কার্যসিদ্ধির জন্য শিখণ্ডীকে ঢাল বানিয়ে তার পেছনে মুখ লুকিয়েছে। নাট্যকার চৈতন্যদেবের কথা উদাহরণ প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন। তিনি ছিলেন রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত এবং তাঁর হাত ধরেই বাংলায় প্রথম নবজাগরণ সংগঠিত হয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নারী হয়েও, সে পালন করেছে পুরুষের কর্তব্য। যার পিতা তাঁকে গড়েছিলেন পুরুষের মতো করে। এই চরিত্রগুলির সঙ্গে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে রূপান্তরকামীদের কোনো তুলনাই চলে না। কারণ সমাজ তাদের মেনে নিতে পারেন না। প্রতিদিন মানুষের বাঁকা দৃষ্টি তাদের হজম করতে হয়। আর এখান থেকেই শুরু হয়, তাদের আত্মস্বীকৃতির লড়াই। সমাজে যেমন অভিনেতা কৌশিকের মতো চরিত্র রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে পরিচালক অমলদার মতো সহমর্মী মানুষও রয়েছেন। যারা তাদের মতো মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দেন। রুদ্র তাই তার মাকে আত্মবিশ্বাসের বর্ম পড়ে নিতে বলেছেন। রুদ্র নিজের যোগ্যতায় 'নাট্যতীর্থ' গ্রুপ থিয়েটারে লিড রোলে

অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে যায়। অবশ্য এর জন্য তাকে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়েছে পরিচালক অমলদার কাছে। রুদ্র রাধার ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করে দর্শকের প্রশংসা আদায় করে নেয়।

নাট্যকার রাধাকৃষ্ণের প্রচলিত লোকগাথাকে ব্যবহার করার পাশাপাশি বৈষ্ণব পদাবলী এবং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর আখ্যান ব্যবহার করেছেন। রূপান্তরকামী মানুষদের জীবনের নানা অভিঘাত ও অভিমান থেকে উত্তরণ যাত্রার যে সংঘর্ষ এবং লড়াই করে অধিকার আদায় ও সভ্য সমাজে নিজেদের স্বীকৃতি স্থাপন করার যে জেদ, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে মানুষ নিজের পরিচিতি নিয়ে বাঁচতে চায়। আর এই বাঁচার অধিকারে সমাজ বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় যারা পৃথিবী জুড়ে লড়াই করে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জায়গা খুঁজে নিচ্ছেন, তারা হলেন এলজিবিটি (লেসবিয়ান-গে-বাইসেক্সুয়াল-ট্রান্সজেন্ডার) কমিউনিটির মানুষ। তারা নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে সমাজে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে চায়। 'অন্তরিত' নাটক বদলাতে থাকা সমাজ, নিজেকে বদলাতে চাওয়া কিছু মানুষ ও তাদের জীবন সংগ্রামের কথাই বলে। নাট্যকার বিশ্বসাহিত্যে প্রেমের অপূর্ব নিদর্শন স্বরূপ বৈষ্ণব পদাবলীর কথা তুলে ধরার পাশাপাশি শেকড় সন্ধান করেছেন দেশজ সাহিত্যের নানা উপাদানকে কীভাবে থিয়েটারে প্রয়োগ করা যায়। দেশজ সাহিত্যের মণিমুক্তাগুলিকে থিয়েটারে ব্যবহার করাকে দায়বদ্ধতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রূপান্তরকামী মানুষদের কথা শুধু বর্তমান সময়ে সাহিত্যে নয়, এঁদের উপস্থিতি মহাভারতেও লক্ষিত হয়। মহাভারতের শিখণ্ডী থেকে শুরু করে চিত্রাঙ্গদা প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় রূপান্তরের মানসিকতা। রূপান্তরকামী মানুষদের বায়োলজিক্যাল পরিচয়ের পাশাপাশি সমান গুরুত্ব পেয়েছে তাদের সাইকোলজিক্যাল অবস্থান। এঁরা জন্মগতভাবে পুরুষ বা নারী হলেও বায়োলজিক্যাল সমস্যার জন্যই সাইকোলজিক্যাল অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়। তাদের মনে একটি নারী বা পুরুষের মন লালিত হতে থাকে। এ জন্যই তাদের লিঙ্গগত সমস্যায় পড়তে হয় এবং সহ্য করতে হয় সামাজের তীক্ষ্ণ কটাক্ষ। এমনকি অনেক বাবা-মাকেও শুনতে হয় নানা গঞ্জনা। অথচ রূপান্তরকামী বা সমকামীরা সমাজে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে চায়, কারণ তারাও মানুষ। এঁরা সমাজে চলতে গিয়ে কীরকম বাঁকাবাঁকা কথার সম্মুখীন হন, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আলোচ্য নাটকে। তাঁরা যদি সমাজে সাধারণ মানুষের মতো প্ল্যাটফর্ম পেয়ে থাকেন, তাহলে তারাও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। প্রতিষ্ঠিত হবার চেতনা থেকে মানুষের অন্তর্নিহিত মানবিক কামনাবাসনাকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে শুরু করল, তৈরি হল এক প্রতিবাদের স্বর। তারা মান্যসমাজের সামনে আওয়াজ তুলতে শুরু করে, একজন মানুষের বায়োলজিক্যাল পরিচয় না কী সাইকোলজিক্যাল পরিচয় কোনটি হবে মানুষের মুখ্য পরিচয়? মানুষ বাঁচতে চায় তার নিজের মতো করে, সমাজের চাপিয়ে দেওয়া লিঙ্গবৈষম্যের রাজনীতির মধ্য দিয়ে নয়। একটি মানুষ তার বায়োলজিক্যাল পরিচয় নিয়ে সমাজে বেঁচে থাকলেও, তার অন্তরের মন বা সাইকোলজিক্যাল ব্যাপারগুলিকে সমাজ কোনোদিনও মান্যতা দিতে চায়নি। অথচ সমাজ নির্দিষ্ট করে দিতে চেয়েছে— 'অন্যরকম মানুষ' বলে। ফলে তৈরি হয়েছে লিঙ্গগত বিভেদ ও বৈষম্য। আর এভাবে তৈরি হতে থাকে জেন্ডারক্রাইসিস। তাই বলা যায়, সমাজের চোখে এই অন্যরকম মানুষ অর্থাৎ রূপান্তরকামী বা সমকামী মানুষদের জীবনে চলার পথে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তারা জন্মগতভাবে পুরুষ বা নারী হলেও, মন ও মানসিকতায় নিজেদের নারী ও

পুরুষরূপে কল্পনা করেন এবং নিজেদের ঐরূপে ধারণ করেন। তারা যদি সঠিক শিক্ষা ও মূলস্রোতে থাকেন, তাহলে তাঁরাও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন নিজেদের যোগ্যতায়। এ সব সমস্যা গোটা ভারতবর্ষের সমস্যা হলেও, এই সকল সমস্যাগুলি স্থানীয় অঞ্চলেও লক্ষিত হয়ে থাকে।

বরুণ দেবের 'আইডেন্টিটি' (২০২৪) নাটকের মাধ্যমে সমাজের LGBTQ+ মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-হতাশা-যন্ত্রণা-সফলতার কথা উঠে এসেছে। নাটকে রূপক ও সমীর এবং বিপ্লবী ও ঈশিতা-র মাধ্যমে নাট্যকার সমকামী-উভয়কামী-রূপান্তরকামী মানুষদের জীবনের লক্ষ্য, পারিবারিক অসন্তোষ, সমাজ ব্যবস্থা তথা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আক্ষেপের সুর অনুরণিত হয়েছে। নাটকে ঈশিতা-বিপ্লবীর মতো নারী সমকামী মানুষের জীবন যন্ত্রণা, সফলতা ও আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে সমগ্র সমকামী সমাজের কথাকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। ঈশিতা ও বিপ্লবীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ঈশিতা বিপ্লবীকে পড়ালেখায় সাহায্য করত এবং তার অনুপ্রেরণায় বিপ্লবী JEE Exam-এ ভালো Rank করে। তাদের এই ঘনিষ্ট বন্ধুত্বের খবর তাদের বান্ধবি রিয়া বিপ্লবীর বাবাকে দেবার পর তাদের জীবনে নেমে দুর্বিপাক। এ জন্যই বিপ্লবীকে Mechanical Engineering পড়তে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি তার পিতা। এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মেয়ের সমকামী মানসিকতা। একটি মেয়ে আরেকটি মেয়েকে ভালোবাসার বিষয় সমাজ যেমন মেনে নিতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে বিপ্লবীর পিতাও মেনে নিতে পারেনি। বিপ্লবীর বিবাহ ঠিক করা হয়। কিন্তু সে বিয়ে করতে চায়নি, হতে চেয়েছে ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং নিজস্ব জীবনের পথ নিজেই ঠিক করতে চেয়েছে। একজন মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার ঘটনাকে পিতা মেনে নিতে পারেনি, তাই সে বলেছে, 'ভেবেছিলাম গ্রাজুয়েশনটা করাবো কিন্তু যা শুরু করেছে, বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই'। বিপ্লবীর অবস্থানের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, এরূপ অবস্থায় পিতা যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত হয়েছে এভাবে-

> "মুখে চুন-কালি মাখা বাকি রাখলে না। ঐ ঈশিতার সঙ্গে মেলা-মেশা বন্ধ কর...এক তো ছেলেদের মত হাবভাব। এতদিন কিছু বলিনি, এখন আর না বলে উপায় নেই। ওই মেয়েটা একেবারেই সুবিধার নয়।"[৯]

এখানে প্রথাগতভাবে বিপ্লবী ও ঈশিতার সম্পর্ককে মেনে নিতে চায়নি পিতা। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে সমাজ কীভাবে তা মেনে নেবে। কারণ, স্বাভাবিক জীবন বলতে একজন নারী পুরুষের প্রতি আসক্ত হবে, এটাই স্বাভাবিক কিন্তু রূপান্তরকামীরা তা থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। সমাজ ও সামাজিক দিক থেকে মুক্তি পেতে চায় এই সমাজের মানুষেরা। একজন নারী কেন নারীর প্রতি ও পুরুষ কেন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় তা জীববিজ্ঞানের সাহায্যে নাট্যকার তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সেইসঙ্গে সমলিঙ্গের প্রতি ঘনিষ্ট হবার বায়োলজিক্যাল ও সাইকোলজিক্যাল বিশ্লেষণ তুলে ধরে এ নাটক। সমাজ ও পরিবার যখন সমকামীদের মেনে নিতে চায়না, তখন তারা আশ্রয় খোঁজেন এমন এক মানুষের যিনি এই অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাবেন। নাটকে ঈশিতা ও বিপ্লবীর সম্পর্ককে যখন সমাজ ও পরিবার মেনে নিতে চায়নি, তখন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মাস্টারমশাই সব্যসাচী। বিপদের সময়ে তারা সব্যসাচী স্যারের পরামর্শ ও সাহায্য পাওয়ার কথা ভেবেছে। কিন্তু যখন সে আশাও আর থাকছে না তখন ঈশিতা আক্ষেপের সুরে বলেছে, 'সমাজে আমাদের

মতন মানুষদের স্বপ্নগুলোর কোনো মূল্য নেই'। এক্ষেত্রে দেখা গেল, তাদের মাস্টারমশাই সব্যসাচীও সমাজের চাপে কোণঠাসা হয়ে পড়েন এবং তাদের জন্য বিশেষ কোনো সাহায্য করতে পারেননি।

নাটকে রাকেশ ও রূপকের সম্পর্কও নিয়েও একই সমস্যা দেখা দেয়। তারা একে অপরকে ভালোবাসত। তাদের সম্পর্কের কথা সমাজ ও পরিবার মেনে নিতে পারেনি। এ অবস্থায় রাকেশ নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এভাবে- 'আমাদের সমাজে আমার মতো মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নেই'। নাট্যকার রাকেশ ও রূপক চরিত্রের মাধ্যমে সমকামী মানুষদের জীবন যন্ত্রণার কথাই ব্যক্ত করেছেন। রূপকের বাবা অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার। তার বাবা চায়নি রূপক মেকআপ শিল্পী হোক। বাবা চেয়েছে তার ছেলে আর্মিতে যোগ দিক। কিন্তু রূপক রং তুলির কাজে স্বচ্ছন্দ অনুভব করেছে এবং তার বাবাকে বলেছে-

> "বাবা আমি পুলিশ হতে চাই না! তোমার শখ আমার উপর কেন চাপিয়ে দিচ্ছো? আমার জগৎ এই রঙ তুলিতেই। তুমি জানো তো আমি ছোট থেকেই আঁকা আঁকি এসব ভালোবেসে এসেছি। আমি একজন মেক-আপ আর্টিস্ট হতে চাই বাবা! বড় বড় শিল্পীদের আমি নিজের হাতে সাজাবো বাবা! তাই কলকাতাতে Cosmetology নিয়ে পড়তে চাই।"[১০]

রূপক একজন রূপান্তরকামী। সে নিজেকে নারী বলে মনে করেন। কিন্তু তার বাবা এসব কাজ কর্মকে সমর্থন করেনি। এমনকি রূপককে শুনতে হয়েছে, 'মেয়ে সেজে আমার মান সম্মান ডোবাস না'। রাকেশ ও রূপকের সম্পর্কের কথা শোনার পর তার বাবার প্রতিক্রিয়া ছিল এমন, 'তুই একটি ছেলে হয়ে আরেকটি ছেলেকে ভালবাসিস? ছিঃ, তোকে ছেলে বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হচ্ছে।'[১১] একজন ছেলের মেয়েলি স্বভাবকে মেনে নিতে পারেনি রূপকের বাবা। সমাজ রূপান্তরকামী বা সমকামীদের স্বীকার করতে চায়না। অথচ বর্তমান সময়ে মানুষের বায়োলজিক্যাল পরিচয় অপেক্ষা সাইকোলজিক্যাল পরিচয় মুখ্য হয়ে উঠছে। পরিবারের বাবা-মা যখন পুত্রের মেয়েলি আচরণ বা কন্যার পুরুষালি স্বভাবকে মেনে নিতে পারে না, তখন সমাজের অবস্থান কীরূপ হয় তা সহজে অনুমেয়। রূপান্তরকামিতা বা সমকামিতা আইনি স্বীকৃতি পেলেও সমাজ তা এখনও মেনে নিতে পারে না। নাট্যকার বরুণ দেব এ নাটকের মাধ্যমে রূপান্তরকামী বা সমকামী মানুষদের স্বাভাবিকভাবে জীবন ধারণ ও সমানাধিকারের পক্ষে কথা বলেছেন। এ অধিকার যেদিন পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন সমাজের মূল স্রোতে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে সসম্মানে।

সমাজ পুরুষ ও নারী এই দুইভাগে লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতির সূচনা করে, যা তার সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে বহন করে। কিন্তু সেক্স বিষয়টা সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ব্যাপার। একজন মানুষ নিজের অন্তর থেকে নিজেকে কীভাবে দেখতে চায় এক্ষেত্রে সে বিষয়টাই মূল প্রতিপাদ্য। নারী বা পুরুষে দেগে দেওয়া সমাজে এই দুই লিঙ্গের বাইরে অবস্থানকারী মানুষরা আজও প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে নিজেদের প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার লাভের আশায়। আইনি স্বীকৃতির (২০১৮) পরেও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিপদে অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি মেলেনি সমকামী, উভয়কামী, রূপান্তরকামী মানুষদের। ইন্টারনেট, সোস্যাল মিডিয়ার দৌলতে এই বিষয়ে চর্চা এখন পূর্বের তুলনায় অধিকতর। সম্প্রতি LGBTQ+ রা তাদের জীবন যাপন ও সামাজিক অধিকার

নিয়ে এখনও সংগ্রামশীল। সমগ্র বঙ্গের মতো প্রান্তিক অঞ্চলের থিয়েটারচর্চায় সমকামী-রূপান্তরকামী মানুষদের জীবন যন্ত্রণার কথা ও সামাজিক রূপকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন নাট্যকাররা।

তথ্যসূত্র:

১. ব্রাত্যবসু, 'নাটকসমগ্র' (দ্বিতীয় খণ্ড), 'কৃষ্ণগহ্বর', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, প্রথমপ্রকাশ: মে ২০১০, পৃ. ১৬৩
২. তমোজিৎ রায়, পাণ্ডুলিপি নাটক, রচনাকাল: ২০১৫, পৃ. ৫
৩. তদেব, পৃ.২২
৪. তদেব, পৃ.২৭
৫. প্রণবকুমার ভট্টাচার্য, 'অন্তরিত', পাণ্ডুলিপি নাটক, প্রকাশ: ২০১৮, পৃ. ৫
৬. তদেব, পৃ. ৭
৭. তদেব, পৃ. ১৫
৮. তদেব
৯. বরুণ দেব, 'আইডেন্টিটি', পাণ্ডুলিপি নাটক, প্রকাশ: ২০২৪, পৃ. ৩
১০. তদেব, পৃ. ৯
১১. তদেব, পৃ. ১১